সবে মিলি



জনসংখ্যা শিক্ষা

মানব সম্পদ বিকাশের জন্য শিক্ষামূলক প্রকল্প

সবে মিলি

লেখিকা

রুবী মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা

বাণী ভৌমিক

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

পশ্চিমবঙ্গ

প্রথম প্রকাশ

৯ই মে □ ১৯৯৫

প্রকাশক

অধিকর্তা

জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকল্প

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

পশ্চিমবঙ্গ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

অনুপম সেন

মুদ্রণ ও নির্দেশনা

সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ

১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০৭২

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

২৫/৩, বালীগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা-১৯

ভূমিকা

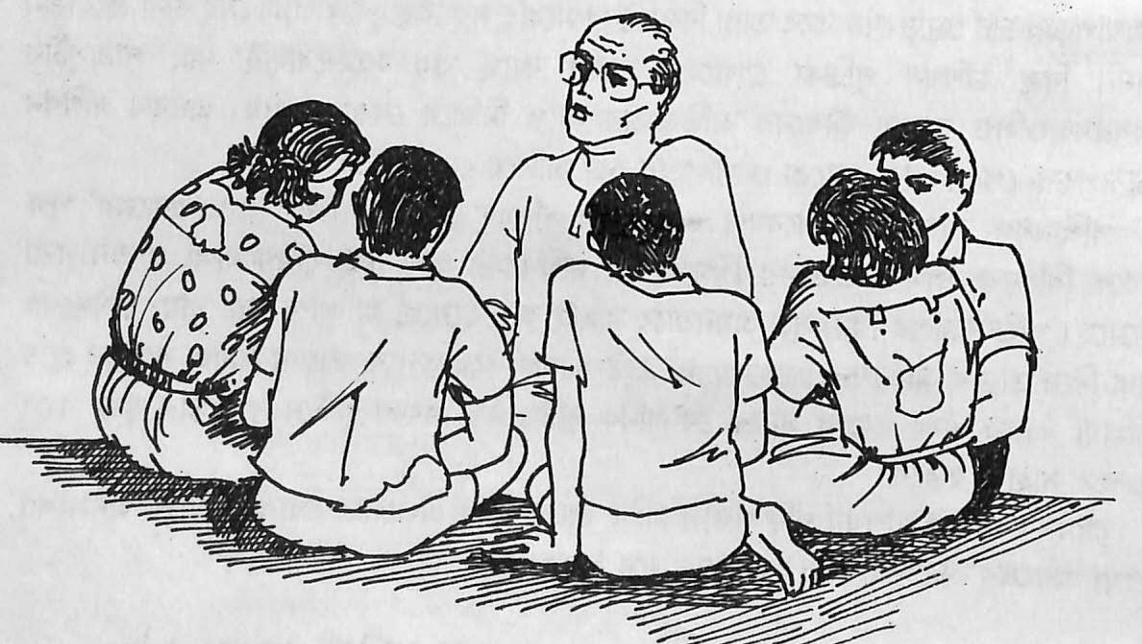
শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় কর্মসূচীতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে নানা আর্থ-সামাজিক কারণে, নয় থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের সকলকেই বিদ্যালয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। আবার কোন রকমে যদিবা তাদের বিদ্যালয়ে আনা যায় তবে চার-পাঁচ বছর তাদের ধরে রাখা যায় না, ফলে বিদ্যালয়ের আওতার বাইরে থেকে যায় লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে। তাদের কাছে যতটুকু পারা যায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিধিমুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থাও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্রে স্বল্পকালের জন্য শিক্ষালাভের পর শিক্ষার্থীরা যদি লেখাপড়ার চর্চা ছেড়ে দেয় তবে তারা কিছুদিনের মধ্যেই সব কিছু ভুলে যায়। সেই জন্য প্রয়োজন এমন কিছু স্বশিখন পুস্তিকা যেগুলো তাদের কাছে শুধু সহজবোধ্যই নয়, পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তুগুলিও তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে নেওয়া সম্ভব। এরকম স্বশিখন পাঠ্যপুস্তক পেলে তারা হয়তো লেখাপড়ার চর্চা চালিয়ে যেতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গ 'রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ'-এর 'জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকল্পের' পক্ষ থেকে বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্রগুলির শিক্ষার্থীদের স্বশিখনের জন্য এই পুস্তিকামালা প্রণয়ন করা হয়েছে। পুস্তিকাগুলির বিষয়সূচী এমনভাবে বাছাই করা হয়েছে, যা আশা করা যায়, স্বশিখনের মধ্য দিয়ে তাদের অধিকতর শিক্ষালাভের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে, তাদের সমাজ সচেতন হতে সাহায্য করবে এবং তাদের মনকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটিয়ে কুসংস্কার মুক্ত করে তুলতে সাহায্য করবে।

যাদের জন্য এই স্বশিখন পুস্তিকাগুলি রচিত তাদের হাতে এগুলোর সদ্ব্যবহার হলে 'জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকল্পের' উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল বলে মনে করব।

সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায়
অধিকর্তা
পপুলেশন এডুকেশন প্রজেক্ট
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
পশ্চিমবঙ্গ।

দাদুর গল্পের আসর



মানুষ কেন সঙ্গী চায়

রতনের বয়স বারো। ওদের পরিবারে ওর মা, বাবা, ভাই, বোন, কাকা, পিসি ছাড়াও আছেন ঠাকুমা ও দাদু। ওরা খুব মিশুকে। পাড়া প্রতিবেশীর সাথে ওদের খুব ভাব।

রতনের দাদু খুব সুন্দর করে গল্প বলতে পারেন। প্রতি রবিবার বিকেলবেলায় এই গল্পের লোভে এ পাড়া ও পাড়ার ছেলেমেয়েরা দাদুর কাছে এসে জড়ো হয়। দাদু একটানা গল্প বলেন না। খানিকটা বলেই প্রশ্ন করতে শুরু করেন। আসলে সবাই মন দিয়ে শুনছে কিনা তা যাচাই করে নেন।

দাদুর গল্প শুরু হল—

আশি বছরের বুড়ি মানদা। ছেলে, বৌ, নাতি, নাতনি নিয়ে সংসার তার। এত লোকজন সংসারে, অথচ তার সঙ্গে দুদণ্ড বসে কথা বলার সময় হয়না কারো। আজকাল সে কানে ভালো শুনতে পায় না। কথা বলতে এসে তাই সবাই বিরক্ত হয়।

সকাল থেকে দাওয়ায় বসে নাতি-নাতনিদের ডাকাডাকি করে মানদা। কেউ বাড়ীর বাইরে গেলে হাজারটা প্রশ্ন করে। কিন্তু তার সব কথার জবাব দেবার মত অত সময় আছে কার?

এক এক সময় বুড়ি নিজের মনেই গজগজ করে—শীত এসে গেল। ছোট নাতিটার জন্য একটা কাঁথা সেলাই করার কথা কতদিন থেকে ভাবছি। তা কে শুনবে আমার কথা? সংক্রান্তির আর মোটে দুদিন বাকি। ঐ দিন কি করবে বউগুলো, তা একবার আমায় বলেও না। আমার কি একটু শুনতেও ইচ্ছে করে না।

আবার কখনো কখনো বুড়ি আগের দিনের কথা ভাবে। তখন মস্ত বড় হাঁড়িতে ভাত চাপাত সে। কত লোক বাড়ীতে। নিজের হাতে এক গামলা ডাল বেটে বড়ি দিত। নানান রকম নক্সা করা বড়ি। তার শাশুড়ি আর পাঁচজন গিন্নিকে ডেকে দেখাতেন। সবাই কত নাম করত। আনন্দে আর গর্বে বুক ভরে যেত তার।

সই শেফালীর কথা মনে পড়ে তার। কত হাসি কত গল্প তার সাথে। তারপর এল সেই ভয়ঙ্কর দিন। মাত্র চার দিনের জ্বরে পাঁচ বছরের ছেলেটা সবাইকে ছেড়ে চলে গেল। সেই শোক সে ভুলতে পারেনি অনেকদিন। তখন তার সই তাকে আগলে রাখত। কত সুখ-দুঃখের সাথী ছিল তার সই শেফালী।

এখন আবার সে সব সুখ-দুঃখের কথা বেশী করে মনে পড়ে। কারোকে শোনাতে ইচ্ছে করে। বড় একা লাগে মানদার।



এই একাকিত্বের অনুভূতি বুকে নিয়েই একদিন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় মানদা।

এতক্ষণ সবাই মুগ্ধ হয়ে গল্প শুনছিল। এবার নড়েচড়ে বসল। কারণ প্রশ্ন শুরু হবে এবার। দাদুর একটা শর্ত আছে। প্রশ্নগুলোর জবাব ঠিক ঠিক দিতে পারলে তবেই পরের রবিবার গল্প হবে, নইলে নয়।

দাদু প্রথম প্রশ্ন করলেন—মানুষ সঙ্গী চায় কেন? গল্প থেকে যা বুঝেছ সেই ভাবে বল।

জয়ন্ত একটু ভেবে নিয়ে বলল, মানুষের একা থাকতে ভাল লাগেনা। সে নিজে যা ভাবে, চিন্তা করে তা অন্যকে বলতে চায়। সে অন্যের সঙ্গে নিজের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিতে চায়। নিজের গুণপনা অন্যের সামনে দেখাতে চায়। অন্যের প্রশংসা পেতে চায়। এইসব কারণে মানুষ সঙ্গী চায়।

দাদু বললেন, বড্ড কঠিন করে বললে। একটু সোজা করে তোমার নিজের কথা দিয়ে বুঝিয়ে দাওনা।

ঠিক আছে। বলে জয়ন্ত বোঝাতে শুরু করল। যেমন—প্রতিবছর আমি যখন মেলায় যাই তখন আমার বন্ধুদের সাথে যেতে ইচ্ছে করে। একা যেতে ভাল লাগে না। কিভাবে মেলায় ঘুরব, কি কিনব— এসব বন্ধুদের যতক্ষণ না বলতে পারি ভেতরে ভেতরে ছটফট করি।

তারপর এই বছর পরীক্ষায় আমি যখন প্রথম হলাম, তখন সবাইকে খবরটা দেবার জন্য আমি ছুটে বাড়ী এসেছিলাম। সবাই যখন আমায় ভাল বলল, আমার খুব আনন্দ হল।

আবার গতবছর যখন আমার দাদু মারা গেলেন, হালিম সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ছিল। ও আমাকে খুব বুঝিয়েছিল। তাতে আমার দুঃখ কমেছিল।

খুশী হয়ে দাদু দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন—

পরিবার কাদের নিয়ে তৈরী?

রতন গড়গড় করে বলতে শুরু করল—বাবা, মা, ভাই, বোন, দাদু, ঠাকুমা, পিসি, কাকা, জ্যাঠা—এইরকম সবাইকে নিয়ে পরিবার। সব পরিবারে অবশ্য এরা সবাই থাকে না। আজকাল বেশীর ভাগ পরিবার ছোট।

দাদু বললেন, পরিবার মানেই মানুষে মানুষে নানা রকমের সম্পর্ক। বাবা-মার সাথে ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক। ছেলেমেয়েদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক। এইরকম অনেকগুলো পরিবার নিয়ে তৈরী হয় সমাজ।

সমাজ কি জানতো? অনেক মানুষ একসাথে বসবাস করলে তাকে সমাজ বলে। যেমন আমাদের গাঁয়ের সমাজ। পাশাপাশি থাকলে মানুষের মধ্যে নানারকমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সমাজে যারা বাস করে তারা নানা কারণে একজন আর একজনের ওপর নির্ভর করে। তাইতো মানুষ দলবেঁধে থাকতে চায়।

ঠিক এই সময় বাড়ীর ভেতর থেকে টুংটাং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। সবাই বুঝল, ঠাকুমা দাদুকে ডাকছেন। ঠাকুমা গত একবছর ধরে অসুস্থ। তিনি ডান হাত আর ডান পা নাড়তে পারেন না। তাই পালা করে বাড়ীর সবাই ঠাকুমার দেখাশোনা করে। সবাই বোঝে, ঠাকুমাকে একা ফেলে রাখলে তিনি কষ্ট পাবেন, মনে দুঃখ পাবেন। আসলে ঠাকুমাতো সবার ওপর নির্ভরশীল।

আজকের মতো আসর শেষ হল।

মানুষে মানুষে নির্ভরতা

পরের রবিবার গল্পের আসর সবে শুরু হয়েছে। পাড়ার পাঁচু খুড়ো হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল, হবিবুর মিঞার বাড়ীতে আগুন লেগেছে। শোনামাত্র দাদু প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। ছেলেমেয়েরাও ছুটল পিছন পিছন।

দূর থেকে হৈ হল্লা শোনা যাচ্ছে। খড়ের চালে আগুন লেগেছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারধার ভরে গেছে। চীৎকার, চেঁচামেচি। দু-চারজন হ্যারিকেন নিয়ে ছোটাছুটি করছে। পাড়ার ছেলেরা যে যা হাতের কাছে পেয়েছে তাই নিয়ে এসেছে। পাশের ডোবা থেকে জল তুলে ছুঁড়ে দিচ্ছে খড়ের চালে। রতন দেখল, হবিবুর চাচার বড় দুই ছেলে আর তাদের বন্ধুরা কোথা থেকে মোটা মোটা বাঁশ নিয়ে এসে পিটিয়ে পিটিয়ে আগুন নেভাতে চেষ্টা করছে। আগুন এখনও খুব একটা ছড়াতে পারেনি।



হবিবুর চাচা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে একপাশে। দাদু এসে আগেই খোঁজ নিলেন ঘরের ভিতর থেকে সবাই বেরিয়ে আসতে পেরেছে কিনা।

দাদুর কথাটা শুনে সবার টনক নড়ল। খোঁজ-খোঁজ পড়ে গেল। কিন্তু চাচার বুড়ি মা কোথায়? অন্যদিনের মত আজও ঐ ঘরে জানালার কাছে বসেছিলো সে। জানালায় বসে রাস্তায় লোক চলাচল দেখতে বুড়ি খুব ভালবাসে। আগুনের কথা শোনামাত্র চাচী তার মেয়েকে নিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসেছে। বুড়ির কথা কারোর খেয়াল হয়নি।

বুড়িকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। রতন দেখল হবিবুর চাচা প্রায় টলতে টলতে মায়ের খোঁজে ঐ আগুন লাগা ঘরের দিকে যাচ্ছে। দৌড়ে গিয়ে সে চাচার কোমর জড়িয়ে ধরে চেঁচাতে লাগল, চাচা যেও না। তুমি পুড়ে মরবে। দাদু ও রমাপদ জ্যাঠা জোর করে চাচাকে মাটিতে বসিয়ে দিলেন। চাচা কপাল চাপড়াতে লাগল আর বলতে লাগল, হায় আল্লা। এ কী গুনাহ করলাম আমি। আমায় শাস্তি দাও আল্লা। আমার আম্মাকে ফিরিয়ে দাও আল্লা। মেয়েদের মধ্যে কান্নার রোল উঠল।

হঠাৎ সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে কে একজন জ্বলন্ত দাওয়া থেকে নেমে এল। আরে! এতো পাড়ার আধপাগলা খ্যাঁদা। রতন দেখল খ্যাঁদাদা চাচার মাকে কোল থেকে নামিয়ে দিল। তারপরই খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে বলল, কি? আর কেউ পারল? যা কষ্টে বাঁচিয়ে এনেছি। যতবার বেরোতে যাই, একটা করে কাঠ খসে পড়ে। শেষে আগুনের মধ্যে দিয়ে চলে এলাম।

চাচা খ্যাঁদাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল আর বলতে লাগল, কে বলে তুই পাগল? ওরে খ্যাঁদা, তুই যে আমার সন্তানের চেয়েও বেশী।

কিন্তু খ্যাঁদার ডান হাতে চাচার হাতের চাপ পড়তেই খ্যাঁদা বিকট ভাবে চেঁচিয়ে

উঠল। হ্যারিকেনের আলোয় চাচা দেখল খ্যাঁদার ডান হাতের কনুই পর্যন্ত ঝলসে গিয়ে দগ দগ করছে। সবাই দেখে আঁতকে উঠল।

চাচা এক মুহূর্ত দেরী করলনা। খ্যাঁদাকে সাইকেলে চাপিয়ে হেলথ্ সেন্টারের দিকে রওনা হল। সঙ্গে গেল হারু কাকা আর মধুদা।

সবাই মিলে এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নেভাল। চাচার একখানা ঘর পুড়েছে। অন্য দু'খানার কোন ক্ষতি হয়নি। ঠিক হল, কাল থেকে চাচার পোড়া ঘর আবার মেরামত করা হবে। চাল ছাওয়া হবে। পাড়ার সবাই হাত লাগাবে।

আজ চাচার বাড়ীতে রান্না হবে না। পাশের বাড়ীর কাকীমা, মানে মধুদার মা, ওদের সবার জন্য ভাত চাপিয়ে দিয়েছে। এখন চাচার ফেরার অপেক্ষা।

রাত বাড়ছে। যে যার বাড়ীর দিকে রওনা হল। সবার মুখেই শুধু খ্যাঁদার নাম।

চাচার দেরী দেখে বুড়ি মা অস্থির হয়ে উঠল। খ্যাঁদা ফিরে না আসা পর্যন্ত সে কিছু মুখে দেবে না। অনেক পীড়াপীড়িতেও সে রাজী হল না কিছু খেতে। তাই চাচার দুই ছেলে হেলথ্ সেন্টারের দিকে রওনা দিল খ্যাঁদা আর চাচার খোঁজে।

কেন এই নির্ভরতা

এই রবিবারে দাদু শুরু করলেন হবিবুর চাচার বাড়ীর আগুন লাগার ঘটনা দিয়ে। বললেন, দেখেছ তো, মুনষ কেন মানুষের ওপর নির্ভর করে?

অনুপ বলল, হ্যাঁ দাদু, সেদিন সবাই মিলে জল না ঢাললে চাচার বাকী ক'খানা ঘরও পুড়ে ছাই হয়ে যেত। চাচার বাড়ীর লোকেরা একা আগুন নেভাতে পারতনা। চাচার বুড়ি মাকেও বাঁচানো যেতনা।

ঠিকই তো। দেখো, মানুষ মানুষের ওপর নির্ভর করে নানা কারণে। যেমন ধর, তোমার যদি বড় কোনো অসুখ করে, তোমার একা একা কিছু করার ক্ষমতা থাকবে না। তোমাকে প্রায় সব ব্যাপারের জন্য বাড়ীর অন্য সবার ওপর নির্ভর করতে হবে।

আবার দেখো, সব পরিবারেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খাওয়া-দাওয়া, জামাকাপড়, লেখাপড়া শেখা—সব কিছুর জন্য বাবা-মার ওপর নির্ভর করে। আবার এই বাবা মাই যখন বুড়ো হন, তখন তারাই আবার নির্ভর করেন সেই সব সন্তানদের ওপর।

সমাজেও ঠিক একইভাবে খাবার, বাসস্থান, পোশাক-আশাক, লেখাপড়া, অসুখ বিসুখ ধনসম্পত্তি—সব কিছুর জন্য মানুষ মানুষের ওপর নির্ভর করে। একজন মানুষের পক্ষে তো সব কাজ শেখা বা করা সম্ভব নয়। কিন্তু একজন মানুষের প্রয়োজন অনেক কিছুর। যেমন ধর চাষী। চাষী ফসল ফলান। কিন্তু শুধু ফসলে তো জামাকাপড়, লেখাপড়া শেখা, ওষুধপত্র—এই সব কিছুর প্রয়োজন মেটে না। তাই তাকে অন্য মানুষের ওপর নির্ভর করতে হয়।

আবার দেখো, তাঁতী, জেলে, মজুর, পুলিশ, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক—সবাইকে

চাষীর ওপর নির্ভর করতে হয় খাবারের জন্য।

আরো দেখো, তোমরা লেখাপড়া শেখার জন্য নির্ভর কর শিক্ষকের ওপর। শিক্ষক অসুখ-বিসুখে নির্ভর করে ডাক্তার বা কবিরাজের ওপর। আবার কবিরাজ বা ডাক্তার মামলা-মকদ্দমা লড়বার জন্য নির্ভর করে উকিলের ওপর। উকিল আবার ঘরবাড়ী তৈরীর জন্য নির্ভর করে মজুরদের ওপর। মজুর শিক্ষার জন্য নির্ভর করে শিক্ষকের ওপর। কতভাবে যে মানুষে মানুষে নির্ভরতা তা বলে শেষ করা যায় না। পরস্পরের ওপর এই নির্ভরতার জন্যই মানুষ একজোট হয়ে থাকতে চায়।



দাদু থামতেই শিউলি বলল, তাছাড়া একজোট হয়ে কাজ করলে কাজ ভাল হয়। ভাল ফলও পাওয়া যায়। তাই না দাদু?

খুব সত্যি কথা। বললেন দাদু। একজন মানুষ একা যা পারে না, একদল মানুষ তা পারে। শুধু আজকের মানুষই নয়, সব যুগেই মানুষ নিজের প্রয়োজনে জোট বেঁধেছে। দলবেঁধে কাজ করেছে।

সেই আদিম মানুষের কথাই ধর না। তারাও বুঝেছিল একসাথে শিকার করতে বেরুলে বন্যজন্তুর হাত থেকে নিজেদের বাঁচান সহজ হয়। বেশী খাবার যোগাড় করা যায়। বৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প—এইসব বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করা সহজ হয়। আরো পরে তারা বুঝেছিল একজোটে ফসল ফলালে বেশী ফসল পাওয়া যায়।

আমাদের গাঁয়ের কথা ভাব। এই যে গতবছর খুদিয়া নদীতে বাঁধ দেওয়া হল—কত লোক খেটেছিল?

জয়ন্ত বলল, অনেক লোক।—দু'শো জন তো হবেই। তাহলেই দেখো, অনেকে মিলে শ্রম না দিলে কোন বড় কাজ হয় না। এই যে কলকারখানা, খনি, ক্ষেত খামার, হাসপাতাল, অফিস, কোর্ট, কাছারি, ইস্কুল—সব জায়গায় এত এত কাজ হচ্ছে, এত উৎপাদন হচ্ছে—তা একার চেষ্টায় নয়। একার শ্রমে নয়।

আবার দেখো, আমরা যাদের ভোট নিয়ে নির্বাচিত করছি তারা মিলিতভাবে দেশের শাসন কাজ চালাচ্ছে।

তোমরা, এই গাঁয়ের ছেলেমেয়েরাও যদি একজোটে কোনো কাজ কর, তোমরাও খুব ভাল ফল পাবে।

কথাটা শেষ হতে না হতে ও পাড়ার প্রতিমা কাকী ঘরে এসে ঢুকল। কাকীকে

দেখে দাদু দু'হাত বাড়িয়ে বললেন, আয় মা, আয়।

প্রতিমা কাকী গতবছর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিতেছে। কাকী গাঁয়ের কথা খুব ভাবে। কি করলে গাঁয়ের ভাল হবে, কি করলে সবাই লেখাপড়া শিখতে পারবে, গাঁয়ের মানুষ কিভাবে খাওয়ার জল পাবে—এসবের জন্য কাকী অনেক চেষ্টা করে।

দাদুকে ঢিপ করে প্রণাম করে কাকী ছেলেমেয়েদের পাশে বসে পড়ল। তারপর ভূমিকা না করেই বলল, জ্যাঠা, ক'দিন ধরে একটা কথা ভাবছি।

নিশ্চয়ই গাঁয়ের কথা? বলে দাদু মিটমিট করে হাসতে লাগলেন।

হ্যাঁগো জ্যাঠা। তোমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে হাটতলা অবধি যাওয়ার রাস্তাটার কথা ক'দিন ধরেই ভাবছি। বর্ষাকালে ঐ এবড়ো থেবড়ো রাস্তার যা হাল হয়। তা বর্ষাতো এসে পড়ল বলে। তাই ভাবছি, বর্ষা জাঁকিয়ে আসার আগেই এ পাড়া, ও পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাজে লেগে পড়লে কেমন হয়?—দাদুর মত জানতে চাইল কাকী।

সবাই মিলে রাস্তাটা মেরামত করতে চাসতো? এতো খুব ভাল কথা। লেগে পড়, লেগে পড়। আনন্দে দাদু মাথা নাড়তে লাগলেন।

তোমাকে কিন্তু সাথে থাকতে হবে জ্যাঠা—আবদার করে বলে কাকী।

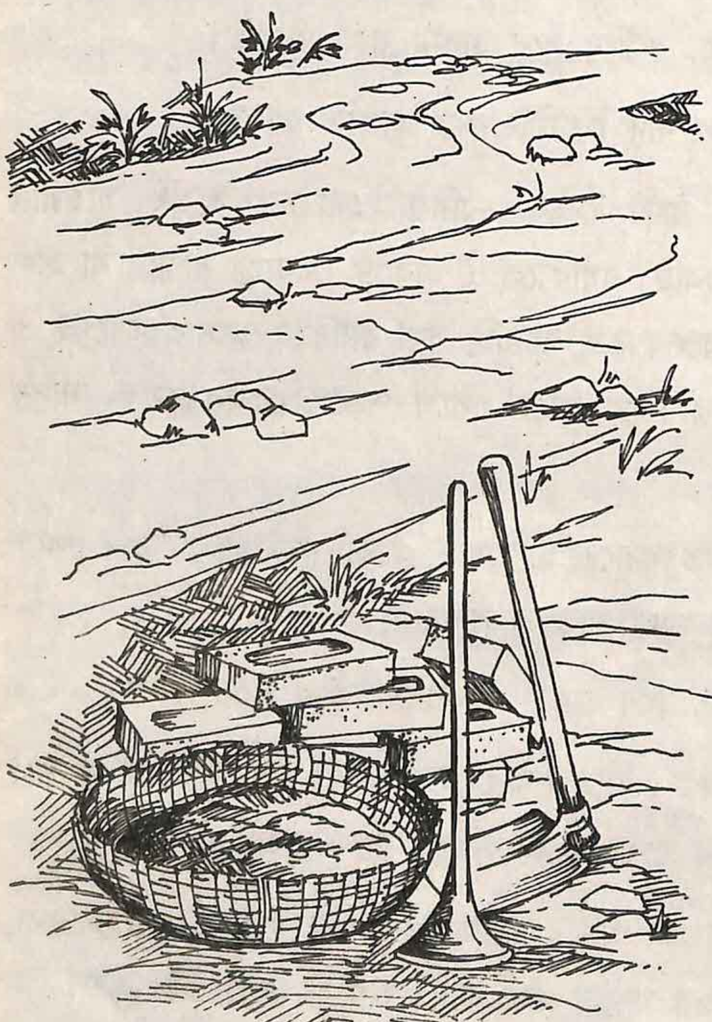
হ্যাঁ রে হ্যাঁ, থাকব। গাঁয়ের কাজ—এতে সবার ভালো হবে। আর আমি থাকব না? আমি নিজে গিয়ে এদের সবার বাবা মাকে বুঝিয়ে বলে রাজী করাব।

তাহলে সামনের রবিবার সকাল আটটা থেকে কাজ শুরু হচ্ছে। ছেলেমেয়েরা, তোমরা সবাই সময়মতো মোড়ের মাথায় জড় হবে। আমরা কাজ শুরু করব।—কাকী উঠে দাঁড়াল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওরা সবাই আসবে। এক্ষুণি শিউলি বলছিল, একজোটে কাজ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এবার কাজ করলে হাতে নাতে দেখবে ফলটা কেমন।

কিরে? তোরা রাস্তাটা ভালমত মেরামত করতে পারবি তো? ভয়ে পালিয়ে আসবি না তো?—দাদু হাসতে লাগলেন।

ভগবতী ও ওর দাদা যাদু মুখে মুখে ভালো ছড়া কাটতে পারে। যাদু বলে উঠল,



কাজ করব সবাই মিলে
ভয়টা কিসের তরে?
জান লড়িয়ে খাটলে আবার
হার হয়েছে কবে?

ভগবতী বলল,

মাটি ফেলে ইঁট বিছিয়ে
রাস্তা তৈরী হবে,
সাইকেল আর গরুর গাড়ী
গড়গড়িয়ে যাবে।

দাদু যোগ করলেন,

থাকবে দাদু তোদের পাশে
কোদাল ঝুড়ি হাতে,
কাজের শেষে মণ্ডা মেঠাই
পড়বে তোদের পাতে।

কাকী শেষ করল,

গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতে
হাঁটবে মানুষ সুখে,
ধন্যি গাঁয়ের ছেলেমেয়ে
শুনবি সবার মুখে।

দশে মিলি করি কাজ

পরের রবিবার সকালে মোড়ের মাথায় দুই পাড়ার নানান বয়সী কুড়িজন ছেলেমেয়ে এসে জড় হল। প্রতিমা কাকী ও দাদু আগেই এসে গেছেন। কাকী পঞ্চায়েত সমিতি থেকে কোদাল, ঝুড়ি, দুরমুশ সব যোগাড় করে এনেছে। দাদু হাঁকডাক করে সবাইকে মাতিয়ে তুললেন।

কাকী সবাইকে কাজ বুঝিয়ে দিল। ঠিক হল প্রথম দফায় বড় পাঁচজন ছেলেমেয়ে কুপিয়ে মাটি তুলবে ঝুড়িতে। ছোট পাঁচজন মাটি ভর্তি ঝুড়ি বয়ে এনে মাটি ফেলবে রাস্তায়। বাকী দশজন রাস্তার মাটি সমান করবে।

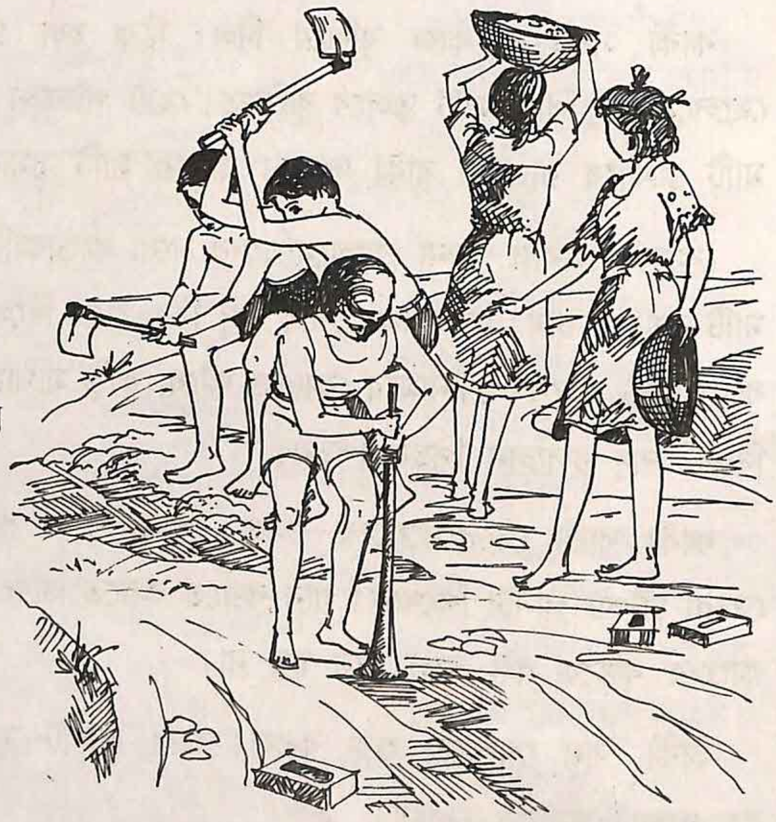
কোদাল নেবার জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সবাই আগে মাটি কাটতে চায়। গোলমাল দেখে দাদু ঠিক করে দিলেন কারা মাটি কাটবে আর কারা ঝুড়ি বইবে। শোনামাত্র কোদাল কাঁধে, ঝুড়ি মাথায় সব ছুটল পাশের ডাঙার দিকে। দাদু চললেন পিছন পিছন।

কাকী বাকী ছেলেমেয়েদের বলল, শোন্, কাল রাতে একটা গান বেঁধেছি। তোরা চটপট গানটা শিখেনে। গান করতে করতে কাজ করলে মনে আনন্দ থাকে। কাজের কষ্টকে কষ্ট বলে মনে হয় না।

কাকী গান শেখাতে শুরু করল। ওরা চটপট মুখস্থ করে ফেলল গানের কথাগুলো। সুরটাও সোজা।

এরই মধ্যে ছোট ছোট ঝুড়ি মাথায় ছোটদের আসতে দেখা গেল। দুলতে দুলতে আসছে ওরা। ওরা আর একটু কাছে এলে এরা গান জুড়ে দিল।

চলরে চল চলরে চল
কোদাল কাঁধে চল,
সবাই মিলে গাঁয়ের পথটা
সরিয়ে ফেলি চল।
ধররে ধর ধররে ধর
কোদাল তুলে ধর,
কুপিয়ে মাটি সাজিয়ে মাটি
সবার ঝুড়ি ভর।



কররে কর কররে কর
দল বেঁধে কাজ কর,
চলার পথে মাটি ফেলে
পথটা তৈরী কর।

আনরে আন আনরে আন
ইঁটগুলোকে আন,
টুকরো ইঁটে পথ সাজিয়ে
বাড়া গাঁয়ের মান।

চলরে চল চলরে চল
কাঁধ মিলিয়ে চল,
সবাই আছে সবার সাথে
আনন্দেতে চল।

এইভাবে গানও চলল, কাজও চলল। মাঝে বিশ্রাম আর খাওয়া। আবার কাজ। কেউ কাটে মাটি, কেউ বয় ঝুড়ি, কেউ ভাঙ্গে ইঁট, কেউ করে দুরমুশ। ওরা একসাথে কাজ করে, আনন্দে কাজ করে।

পর পর ছয় রবিবার খুব খাটল ওরা। সারা গাঁয়ে রটে গেল ওদের কাজের খবর। সবাই দেখতে এল ওদের কাজ। সবার মিলিত শ্রমে সারাই হল দেড়শো গজ লম্বা আর পাঁচ গজ চওড়া রাস্তা। খানাখন্দ ভরাট হয়ে পুরোনো পথটা লাল টুকটুকে ইঁটের টুকরোয় সাজল। খুশীতে ঝলমল করে উঠল সারা পাড়া।



কিছুদিনের মধ্যে জাঁকিয়ে বৃষ্টি এল। আর কষ্ট নেই হাটে যাবার। রাস্তা সাফসুফ—জল দাঁড়ায় না, কাদা জমে না। ছেলেমেয়েরা একজোটে কাজ করে প্রমাণ করল—

একতাই বল।

কোন মানুষই ফেলনা নয়

আজ দাদু নদীর ওপারের গাঁয়ের এক ছেলের কাহিনী দিয়ে শুরু করলেন। ছেলেটির নাম কালো। গাঁয়ের শেষ প্রান্তে ওদের ঘর। জন্ম থেকে ওর দুটো পা লিকলিকে। পিঠে একটা ছোট কুঁজও আছে। কোন রকমে পা টেনে টেনে ঘরের ভিতর হাঁটাচলা করে কালো।

কালো তার বাবা গুরুপদ দাসের কাছ থেকে জুতো, ব্যাগ এসব সেলাই করা শিখেছে। ওদের বাড়ী থেকে হাটতলা অনেকটা পথ। ওখানে গিয়ে দুবেলা বসতে পারলে কালো দু'পয়সা রোজগার করতে পারত। কিন্তু অতটা পথ রোজ রোজ কালোকে বয়ে নিয়ে যাবে কে?

গুরুপদ শুনেছে আজকাল এমন অনেক সংস্থা হয়েছে যারা কালোর মত প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের নানাভাবে সাহায্য করে। আবার চেষ্টা করলে সরকার থেকেও নাকি সাহায্য পাওয়া যায়। গুরুপদ ভাবে, কোনরকমে তিন চাকাওয়ালা একটা সাইকেল ভ্যান যদি পাওয়া যেত, তাহলে কী ভালই না হোত। কালোকে সেটায় বসিয়ে দিলে সেটা হাত দিয়ে চালিয়ে কালো হাটতলা অবধি যাওয়া আসা করতে পারত। সারাদিন কিছু না হোক সাত আট টাকা আয় করতে পারত। সংসারের কিছুটা সুরাহা হোত।

কিন্তু এর জন্য কি করতে হবে গুরুপদ জানে না। নিজে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায়নি। তাই একটা দরখাস্ত লিখতে হলেও ও পাড়ার কানাই-এর কাছে যেতে হয়। আর শুধু দরখাস্ত লিখলেই তো হল না, নানান জায়গায় দেখা করার ব্যাপারটাও তো আছে।

একদিন মোড়ের মাথায় চায়ের দোকানে বসে গুরুপদ এসব কথা আলোচনা করছে, এমন সময় সেখানে এল বিমান ডাকুয়া। কাজের ছেলে বলে বিমানের খুব নাম ডাক। কোন কাজের দায়িত্ব নিলে করে তবে ছাড়ে।

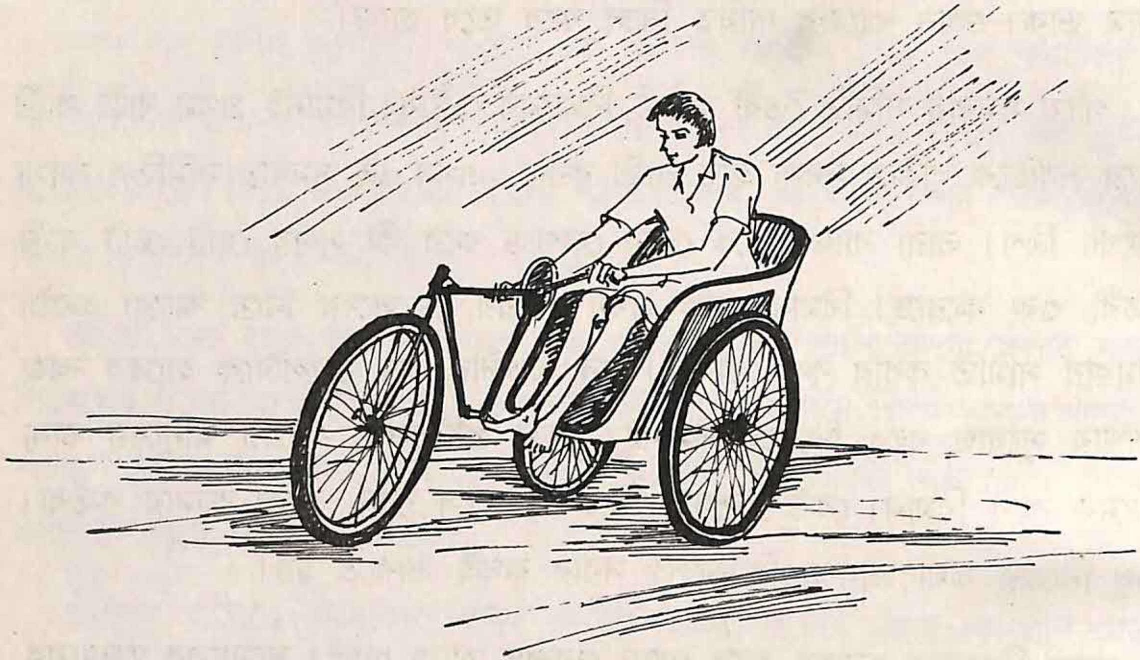
গাঁয়ে সমবায় সমিতি তৈরী হয়েছে বিমানের চেষ্টায়। বিমানই প্রথম বাড়ী বাড়ী ঘুরে সবাইকে বুঝিয়ে সদস্য হতে রাজী করায়। এখন এই সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ত্রিশ। তারা ব্যাঙ্ক থেকে লোন যোগাড় করে কী সুন্দর ছোট ছোট বাড়ী তৈরী শুরু করেছে। বিমান নাকি এখন গাঁয়ের জেলেদের নিয়ে আরো একটা সমবায় সমিতি করার কথা ভাবছে। হারু বাগদীর অন্ধ ছেলেটাকে হাতের কাজ শেখার সুযোগ করে দিয়েছে বিমানই। পাড়া প্রতিবেশী, গাঁয়ের মানুষের জন্য অনেক করে বিমান। কেউ ধন্যবাদ দিতে এলে সে বলে, এতো আমার কর্তব্য। শুধু নিজের কথা ভাবলে কি চলে? সবার কথাই ভাবতে হয়।

আজ বিমানকে হাতের কাছে পেয়ে গুরুপদ তাকে ধরল। সংসারের অভাবের কথা, কালোর শরীরের কথা, সব বলে শেষে বলল, ল্যাংড়া হলে কি হবে, কালোর আমার কাজ করার খুব ইচ্ছে। কাজ শিখেছেও মন্দ না। ওকে একটা গাড়ী পাইয়ে দাও ভাই। একটা কিছু ব্যবস্থা করে দাও যাতে ও কিছু করে খেতে পারে।

বিমান মন দিয়ে সব শুনল। তারপর বলল, দেখি কতটা কি করতে পারি।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে তিন চাকার গাড়ী এল কালোর হাতে।

শুরু হল কালোর নতুন জীবন।



এখন কালো ভালই আয় করে। তার মনে এখন কত জোর, কত আনন্দ। বিমানদার সাহায্যেই সে আজ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে। এ কথা সে কখনও ভোলেনা।

ঘটনাটা বলা শেষ হলে দাদু জানতে চাইলেন প্রতিবন্ধী কাদের বলা হয়।

সুধা বলল, যারা শরীরের দিক থেকে আর পাঁচজনের মত স্বাভাবিক নয়—মানে যাদের শরীরে কোনো খুঁত আছে তাদের বলে শারীরিক প্রতিবন্ধী। যেমন অন্ধ, বোবা, কালা, খোঁড়া—এইসব মানুষ। আর যাদের মাথার গোলমাল আছে তাদের বলে মানসিক প্রতিবন্ধী।

দাদু জানালেন এরকম লক্ষ লক্ষ মানুষ ছড়িয়ে আছে আমাদের দেশের গ্রামে ও শহরে। এদের কাজ করবার ক্ষমতা আছে।

শিখবার সুযোগ পেলে এরাও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। এই এত এত মানুষ কাজ করলে গোটা দেশেরই লাভ। স্বাভাবিক ও প্রতিবন্ধী—এই দুই দলের মানুষের মিলিত পরিশ্রমেই একটা দেশ এগিয়ে যেতে পারে।

জয়ন্ত বলল, দাদু, সরকার থেকে এদের কাজ শিখবার অনেক সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে না?

দাদু বললেন, শুধু সরকার নয়, অনেক বেসরকারী সংস্থাও প্রতিবন্ধীদের কাজ শেখার ও কাজ করার সুযোগ করে দিচ্ছে। প্রতিবন্ধী মানুষেরা আজকাল পাল্লা দিয়ে স্বাভাবিক মানুষের সাথে কাজ করছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়। সারা পৃথিবীর কয়েক কোটি প্রতিবন্ধী মানুষ নানাভাবে দেশের সেবা করছে। এরা প্রমাণ করেছে এরাও দেশের সম্পদ।

এবার বলত, এইসব মানুষদের সাথে তোমরা কেমন আচরণ করবে?—দাদু প্রশ্ন করলেন।

অনন্ত বলল, আমরা এমন কোনো কথা বলব না যাতে তারা মনে দুঃখ পায়। আমরা কখনই তাদের নিয়ে ঠাট্টা বা বিদ্রূপ করব না অথবা টিটকিরি দেব না। দাদু বললেন, ঠিকই বলেছ। এইসব মানুষদের জন্য আমাদের মনে মমতা থাকা দরকার। আমরা তাদের আপনজন ভাবব।

ভগবতী বলল, তাছাড়া আমরা এমন কিছু বলব না বা করব না যাতে তারা নিজেদের বোঝা ভাবে বা অকেজো ভাবে। তাই না? কারণ তারা তো সত্যি বোঝা নয়।

যাদু বলল, বরং আমরা তাদের বোঝাব যে তাদের অনেক ক্ষমতা। আর এই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তারা আর পাঁচজন স্বাভাবিক মানুষের মত অনেক কাজ করতে পারে।

দাদু খুশী হলেন। বললেন, মনে রেখো, নিজের পরিবারেই হোক আর গাঁয়েই হোক—কোন প্রতিবন্ধী মানুষকে কখনই অবহেলা করবে না। মানুষ যেমনই হোক, তাকে অবহেলা করা অপরাধ।

সুধা বলল, কিন্তু দাদু, মেয়েদের কেন অবহেলা করা হয়? তারা তো মানুষ।

দাদু বললেন, কিরকম অবহেলা?

সুধা বলল, তাদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া হয় না। তাদেরও যে লেখাপড়া শেখা দরকার—একথা অনেকে মানতেই চায় না। অনেক সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়।

আর আমাদের বাড়ীতে কি হয় জানেন? যখন কোন জরুরী বিষয়ে আলোচনা হয়, যেমন জমি কেনা বেচা, বা কারো বিয়ে—তখন আমার মায়ের মতকে কেউ গুরুত্বই দেয় না। বেশী কিছু বলতে গেলে বাবা মাকে চুপ করিয়ে দেন। বাবা মনে করেন মায়ের জরুরী ব্যাপার বোঝার ক্ষমতাই নেই। অথচ আমার চেয়ে মাত্র পাঁচ বছরের বড় দাদাকে ডেকে বাবা পরামর্শ করেন।—জবা বলল।

অথচ দেখুন—সেন্টারে আমরা যে সব বই পড়ি তাতে বলা আছে—মেয়েরা দেশের অর্ধেক শক্তি। বুদ্ধিতে বা দেহের শক্তিতে তারা পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সব কাজে তারা সমানভাবে অংশ নিলে তবেই দেশের উন্নতি সম্ভব। —ভগবতী দুঃখ করে বলল।

দাদু বললেন, এ নিয়ে শুধু দুঃখ করলে তো চলবে না। তোমরা বড় হচ্ছো। তোমরা যদি মনে প্রাণে বিশ্বাস করো যে কোন মানুষই ফেলনা নয়, তাহলে সমাজ ঠিক বদলাবে।

তোমরাই এমন সমাজ তৈরী করবে যেখানে ছেলে মেয়েরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে।

হাতে হাত মিলিয়ে

গতকাল ছিল স্বাধীনতা দিবস। ১৫ই আগস্ট। সকালে ছেলেমেয়েরা সেন্টারে গিয়েছিল। সেখানে ভারতের জাতীয় পতাকা তুলে, দেশপ্রেমের গান ও জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে তারা দিনটি উদ্‌যাপন করে।

দিদিমণি তাদের বলেছিলেন, আমরা এখন স্বাধীন ভারতে বাস করি।

যাদের মিলিত চেষ্টায় দেশ স্বাধীন হল---তাদের কথা দিয়ে দাদু আজকের আসর শুরু করলেন।

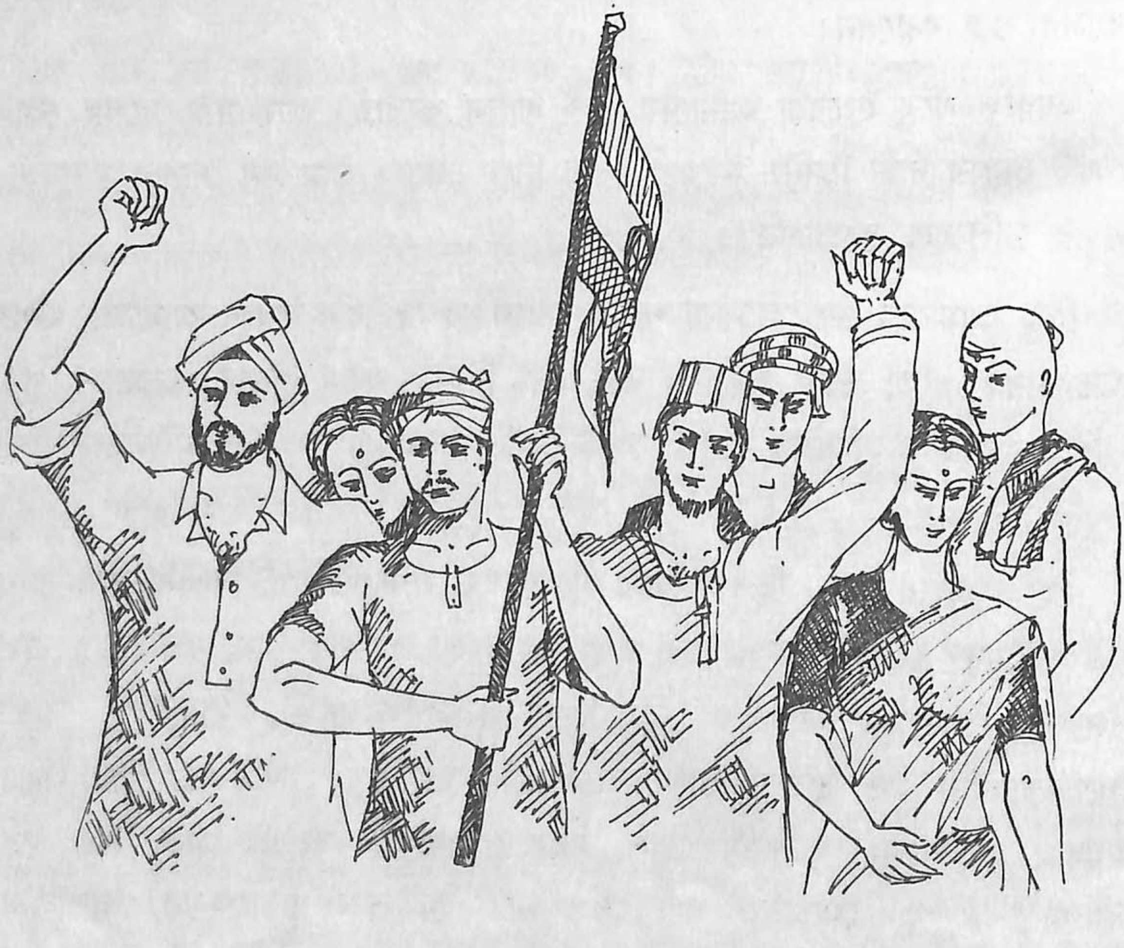
বহুকাল ধরে ইংরেজ আমাদের দেশ শাসন করেছে। আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকার দামী জিনিস নিজের দেশে নিয়ে গেছে। আমাদের দেশের মানুষদের ওপর চালিয়েছে অত্যাচার।

কিন্তু আমাদের দেশ অন্যেরা শাসন করবে কেন? কেন করবে আমাদের ওপর অত্যাচার? এতো ভারি অন্যায়। তাই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল ভারতের পূব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণের মানুষ। কোটি কোটি মানুষ এগিয়ে এল স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে।

এই লড়াই-এ যেমন ছিল বাংলার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পালের মত স্বাধীনতা সংগ্রামী, তেমন ছিল পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়, মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক, গুজরাতের মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, মাদ্রাজের রাজা গোপালাচারীর মত হাজার হাজার দেশপ্রেমী ভারতীয়। ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিল বাংলার সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম বোস, পঞ্জাবের ভগৎ সিং-এর মত কত শত অল্পবয়সী পুরুষ। মেয়েরাও বাদ গেল না। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মাতঙ্গিনী হাজরার মত সাহসী মহিলারা মৃত্যুবরণ করল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরুর মত নেতাদের নাম আজ ঘরে ঘরে। বিনয়, বাদল ও দীনেশ—বাংলার এই বীর সন্তানদের নাম আজ কে না জানে। সিদো, কানহু, বিরশা মুণ্ডার মত স্বাধীনতার বীর যোদ্ধাদের নামে আমাদের বুক গর্বে ভরে ওঠে।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন জাত ও ধর্মের মানুষের মিলিত চেষ্টায় ও ত্যাগে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে।



আবার দেখো, নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা, অন্য দেশের আক্রমণ থেকে নিজের দেশকে রক্ষা করাও একার কাজ নয়। সেখানেও সৈন্যরা দলবেঁধে দেশের সীমানা পাহারা দেয়। যুদ্ধ বাধলে শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য হাজার হাজার জওয়ান একজোটে লড়াই করে। আমাদের স্থল, জল ও বিমান বাহিনীতে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীস্টান, বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী—সব ধর্ম ও জাতের সেনা রয়েছে। যে কোন ধরনের বিপদ থেকে দেশকে মুক্ত করতে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে।

আবার দেশের উন্নতিও নির্ভর করে সব মানুষের মিলিত চেষ্টার ওপর। যেমন ধর শিক্ষা। দেশের সব মানুষ যদি লিখতে, পড়তে ও বুঝতে না শেখে তাহলে নিজের পায়ে দাঁড়াবে কি করে? কিন্তু এত এত মানুষকে লেখাপড়া শেখাবার দায়িত্ব শুধু সরকার নিলে কাজটা শেষ হতে অনেক দেরী হয়ে যাবে। তাই আমরা যে যতটুকু শিখেছি তা যদি অন্যকে শেখাই তাহলে খুব তাড়াতাড়ি গোটা দেশ শিক্ষিত হয়ে উঠবে।

তাহলেই দেখো, সবার চেষ্টা ছাড়া দেশে শিক্ষার প্রসার সম্ভব নয়।

তাছাড়া দেশের মধ্যে যদি ধর্ম, জাতপাত এসব নিয়ে মানুষে মানুষে মারপিট, দাঙ্গা লেগেই থাকে, তাহলে দেশে অশান্তি লেগেই থাকবে। কোন কাজই ভালমত হবে না।

কিন্তু বিভিন্ন জাত ও ধর্মের মানুষের মধ্যে যদি ভাব ও ভালবাসা থাকে, তারা একজোটে অনেক ভাল কাজ, অনেক গঠনমূলক কাজ করতে পারবে। যেমন তোমরা রাস্তাটা তৈরী করেছ।

তোমাদের সবার ধর্ম এক না হলেও তোমরা একে অন্যকে ভালবাস। তোমরা জাতপাতের কথা ভেবে কারোকে সরিয়ে রাখনি। সমাজের সব মানুষের এইরকম মনই তৈরী করা দরকার।

এবার পরিবেশের কথা ভাব। পরিবেশে দূষণ না থাকলে, পরিবেশ সুস্থ থাকলে শরীর ও মন ভাল থাকে। কিন্তু শুধু একার চেষ্টায় পরিবেশ সুস্থ রাখা সম্ভব নয়। রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, গাছলাগান, যে ইঁদারার জল খাওয়া হয় তার চারপাশ পরিষ্কার রাখা, সেই ইঁদারার পাড়ে বসে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, স্নান করা—এসব বন্ধ করা, স্নানের পুকুরে গরু, মোষ স্নান না করান, পুকুর পাড়ে মলমূত্র ত্যাগ না করা, ফসলের মাঠে ক্ষতিকারক কীটনাশক ব্যবহার না করা—এ সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হতে হবে। সবাইকে এই নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে। তবেই না দূষণমুক্ত পরিবেশ পাওয়া সম্ভব।

তোমরা তো জান, আমাদের সমাজে এখনও অনেক খারাপ নিয়ম চালু আছে। আইন করেও এগুলো বন্ধ করা যাচ্ছে না। যেমন মেয়ের বিয়েতে ছেলের বাড়ীর লোকেরা পণ দাবী করে। আবার একই ধরনের কাজে মেয়ে মজুররা ছেলে মজুরদের চেয়ে কম মজুরী পায়। আমাদের দেশের অসংখ্য পরিবারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পায়না। ঐ বয়স থেকে তাদের রোজগার করতে হয়। ছোট জাত, বড় জাত হিসেবে এখনও পর্যন্ত মানুষকে ভাগ করা হয়।

তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ কিছু অসৎ ব্যবসায়ী আজকাল দেশের বনজঙ্গল কেটে চড়া দামে সেই কাঠ বিক্রী করে দিচ্ছে।

নিজের স্বার্থে পরিবেশকে কিভাবে ধ্বংস করছে এরা-একবার ভেবে দেখো।

আবার এক শ্রেণীর মানুষ বনের পশু মেরে পশুর চামড়া, হাড়গোড়, ল্যাজ—এইসব বিদেশে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রী করে দিচ্ছে। কিছু লোক আবার বাইরের দেশ থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে আমাদের দেশে নেশা করার ওযুধ নিয়ে আসছে। এই সব নেশার জিনিস অনেক দামে বিক্রী করছে ছেলেমেয়েদের কাছে। দিনের পর দিন এগুলো খেয়ে তারা ধীরে ধীরে কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। অনেকে

অল্পবয়সে মারাও যাচ্ছে। যারা এসব অন্যায় করছে তারা দেশের শত্রু। সমাজে প্রতিটি মানুষকে একজোট হয়ে এদের বাধা দিতে হবে।

সুতরাং দেশ রক্ষাই বল, আর দেশের উন্নতিই বল—সকলের মিলিত চেষ্টা ছাড়া কোনটাই সম্ভব নয়।

অনেক কথা তো শুনলে, এবার বল দেখি, তোমরা এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে হাতে হাত মিলিয়ে কি কি করতে পার?—বলে দাদু ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হালিম বলল, দাদু, আমরা এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে কতগুলো পোস্টার তৈরী করতে পারি।

সেগুলো নিয়ে গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে মিছিল করে যেতে পারি।—জবা যোগ করল।

অনন্ত বলল, রাস্তার মোড়ে দু'একটা পোস্টার লাগিয়ে দিলেও তো হয়।

প্রস্তাবগুলো সবারই মনে ধরল। ঠিক হল, সবাই মিলে পোস্টারগুলো তৈরী করবে। কেউ লিখবে, কেউ আঁকবে। তারপর আগামী ২৬শে জানুয়ারী সেগুলো নিয়ে গাঁয়ে পদযাত্রায় বেরুবে সবাই।

আর দেরী নয়

আজ ২৬শে জানুয়ারী, প্রজাতন্ত্র দিবস।

গত চারমাস ধরে পড়াশুনা ও কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছেলেমেয়েরা পোস্টার তৈরী করেছে। প্রতিমা কাকী ও দাদু ওদের সাহায্য করেছেন।

ভগবতী ও যাদু মিলে একটা গানও বেঁধে ফেলেছে। প্রতিমা কাকী গানে সুর করে দিয়েছে। এক রবিবার এসে সবাইকে গানটা শিখিয়েও দিয়েছে কাকী। ঠিক হয়েছে, ওরা গান গাইতে গাইতে পোস্টার হাতে গাঁয়ের পথে পথে ঘুরবে।

গতকালই সকালবেলায় হাটতলার মোড়ে দুটো পোস্টার টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা পোস্টারের ছবি তো খুবই সুন্দর হয়েছে। গতকাল হাটবার ছিল। অনেক লোক পোস্টার দু'টো দেখেছে। অনেকে মন দিয়ে লেখাগুলো পড়েওছে। ছেলেমেয়েরা খুব খুশী।



এখন সকাল আটটা। ছেলেমেয়েরা জড় হয়েছে দাদুর বাড়ী। প্রতিমা কাকীকে ওদের সাথে যেতে হবে। ওরাতো আগে কখনও পদযাত্রা করেনি, তাই ভয় ভয় করছে।

দাদু রাজী হলেন। ঠিক হল, সবার আগে জাতীয় পতাকা হাতে থাকবে হালিম। আর সব চেয়ে বড় পোস্টার নিয়ে সবার শেষে থাকবে কাকী।

জাগো জাগো, চেয়ে দেখো, ধ্বংস হল যে সব,



আর দেরী নয়, হাত মেলাও, বন্ধ কর এসব

সকাল ন'টায় দুই সারিতে ভাগ হয়ে ওরা পদযাত্রা শুরু করল। গাঁয়ের মানুষেরা অবাক হয়ে দেখল, তাদেরই ঘরের ছেলেমেয়েরা এক সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার শপথ নিয়ে গান গেয়ে এগিয়ে চলেছে।

ভাঙ্গো ভাঙ্গো, ভেঙ্গে ফেলো, যত আছে কুপ্রথা,
দেরী নয়, দেরী নয়, দেরী নয়, অযথা।
শত্রুরা ছড়িয়ে
ভালবাসা মাড়িয়ে
দেশটাকে কালো মেঘে দিলো যে গো ভরিয়ে,

চলে এস, চলে এস, আছো সবে যে যেথা,
দেরী নয়, দেরী নয়, দেরী নয়, অযথা।

* * * * * * *

এ দেশ তোমার, এ দেশ-আমার,
তোমার আমার, এ দেশ সবার,
এ দেশ গানের, এ দেশ প্রাণের
গানের প্রাণের, এ দেশ মানের,
প্রাণ বাঁচাও, মান বাঁচাও,
তোমার আমার প্রাণ বাঁচাও
সবাই মিলে হাত লাগাও, নয়তো শুধুই কথা
আর দেরী নয়, আর দেরী নয়, দেরী নয় অযথা।

